সুন্দরবন বাস্তুতন্ত্র ও রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র

ড. এম এ বাশার

সুন্দরবনের গাছপালা, কাঠ-খড়ি, পশু-পাখি ও মাছ আর্থিকভাবে কত পয়সা নিয়ে আসে, সেটি দ্বিতীয় সারির বিবেচ্য বিষয়। প্রথম কথা হলো এই বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম পরিবেশগত দিক থেকে কত মূল্যবান এবং কেন ও কীভাবে মূল্যবান। যদি এই সুন্দরবন পরিবেশগত দিক থেকে টিকে থাকে, তাহলেই অর্থনৈতিক মূল্য টিকে থাকবে। তাই আমরা চাই বা না চাই, পারি বা না পারি, বুঝি বা না বুঝি, আমরা বোঝার যোগ্য না অযোগ্য, বিষয়টি রাজনৈতিক কি অরাজনৈতিক–এগুলোর কোনোটিকেই বিবেচনা করার সুযোগ নেই। আমাদের কাজ হবে কোন এজেন্টটি এই বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে এবং কিভাবে করে তা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমাদের বাস্তুতান্ত্রিক স্বাভাবিকতা তলিয়ে দেখতে হবে আগে, তারপর চিন্তা করতে হবে বিদ্যুৎকেন্দ্র হবে কি হবে না। আর বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে এই বাস্তুতন্ত্রের কতটুকু এলাকার মধ্যে তা হওয়া সমীচীন এবং সুন্দরবন সীমানা থেকে কত দূরে হওয়া প্রাকৃতিক দিক থেকে বাঞ্ছনীয়।

আজকাল পত্রপত্রিকায় কথা উঠছে 'রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মত' শিরোনামে। এতে নাগরিক সমাজ বলেছে, বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিকল্প থাকলেও সুন্দরবনের বিকল্প নেই। আবার অন্যদিকে সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, এটি সুন্দরবনের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। বর্তমান অবস্থাটি কোনোভাবেই পক্ষে-বিপক্ষের বিষয় নয়। এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো, সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র প্রাকৃতিকভাবে কতটুকু ভঙ্গুর বা কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিমাণটি সুন্দরবন প্রাকৃতিকভাবে সহ্য করতে পারবে কি পারবে না সেটা। এ বিষয়টি নিয়ে যখন আমরা দায়িত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে এমন কথা শুনি, তখন আমরা যারা পরিবেশবিদ্যার ছাত্র, তারা খুব দুঃখ পাই এবং নিজেদের অসহায় মনে করি। উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকল্পটি স্থাপন করা হলে যে পরিমাণ ছাই উৎপাদন হবে তা সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহার করা হবে। পরিবেশবিদরা বলেন, ছাইয়ের যত শতাংশ বাতাসে চলে যাবে তা কী করে সিমেন্টে নেয়া সম্ভব? যেসব রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হবে সেগুলো জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে জীবের মধ্যে কোন পর্যায়ে ক্রিয়াশীল থাকবে–এসব সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। ছাইয়ের ব্যাপারটি প্রাথমিকভাবে জীবের বাহ্যিক অবস্থায় আঘাত হানবে। কাজেই এখানে ভয়ংকর ব্যাপারটি হলো, ঐসব নির্গত পদার্থ (ভারী ধাতব পদার্থ পারদ, সীসা, আর্সেনিক) কীভাবে জীবের যৌন প্রজননে ধ্বংসাত্মক আঘাত হানবে।

জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীতে চারটি বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থা আছে। যেমন : সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, নদী-বাস্তুতন্ত্র, মোহনা-বাস্তুতন্ত্র এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্র। এই সবগুলো বাস্তুতন্ত্রের সমন্বয়ে সুন্দরবন বাস্তুতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে। আমাদের বঙ্গোপসাগরের পাড় ঘেঁষে বহু নদী মোহনার মিলনস্থলে এই বাস্তুতন্ত্রের অবস্থান। যার উদাহরণ ভৌগোলিকভাবে সারা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

বড় প্রাণীদের বেলায় বাস্তুতন্ত্রে প্রাণীর খাদ্যধাপ নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাণীর দেহে জৈব শক্তি স্থানান্তরের বিষয়টি প্রাণীর অবস্থান উদ্ভিদ থেকে কত দূরে বা নিকটে তার উপর নির্ভরশীল। জীববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বিষয় হলো, যে প্রাণীটি সবচেয়ে শেষের খাদ্যধাপে অবস্থান করবে সে তত বেশি উদ্ভিদ থেকে দূরত্বে থাকবে এবং প্রকৃতিতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ জৈব অবস্থায় অবস্থান করবে। অর্থাৎ প্রকৃতিতে সামান্যতম দূষণ পদার্থই অনেক বেশি করে তাকে আঘাত হানবে। তার প্রতিটি কোষ, কলা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এই আঘাতের প্রভাব পড়বে গভীরভাবে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে এই ঘটনাটি ঘটে তাকে 'বায়োম্যাগনিফিকেশন' বলা হয়। বায়োম্যাগনিফিকেশন যখন প্রাণীর প্রজনন কোষে আঘাত হানে তখনই পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টিতে বাধার আবির্ভাব হয়। একেই দূষণগত 'স্টেরিলাইজেশন' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, বাঘ অনেক পরিচিত একটি প্রাণী এবং সে বনভূমিতে টেরিটরি রক্ষা করে চলে। কাজেই বাঘের ব্যাপারে সুন্দরবনের স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের রহস্য উদঘাটনের উদাহরণ টেনে কথা বলা সহজ। কিন্তু যে চারটি বাস্তুতন্ত্র নিয়ে সুন্দরবন বাস্তুতন্ত্র গঠিত তাদের প্রত্যেকটিতেই যদি কোনো প্রাণীর অবস্থান থাকে এবং প্রাণীটি যদি খাদ্যধাপগুলোর (Trophic Level) শীর্ষে অবস্থান করে তখন তার জন্য যে কোনো দূষণ পদার্থই মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। এ বিষয়টি ঘটবে বায়ো-অ্যাকিউমুলেশনের মাধ্যমে। তখন ঐ প্রাণীর প্রজননক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যাবে। ফলে এই প্রজাতির প্রাণীটি দ্রুত বিলুপ্তির পথে ধাবিত হবে। এমনই একটি প্রাণী হচ্ছে মদনটাক। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীতে চারটি বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থা আছে। যেমন : সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, নদী-বাস্তুতন্ত্র, মোহনা-বাস্তুতন্ত্র এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্র। এই সবগুলো বাস্তুতন্ত্রের সমন্বয়ে সুন্দরবন বাস্তুতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে। আমাদের বঙ্গোপসাগরের পাড় ঘেঁষে বহু নদী মোহনার মিলনস্থলে এই বাস্তুতন্ত্রের অবস্থান। যার উদাহরণ ভৌগোলিকভাবে সারা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এই সুন্দরবনে অনেক জৈব নির্দেশক আছে, যেগুলো বাস্তুতন্ত্রের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের রহস্য উদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনই একটি জৈব ইনডিকেটর নিয়ে এখানে কথা বলতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষকদের নিয়ে জীব ও বৈচিত্র্য নিরূপণের জন্য এ বছরের প্রথম দিকে আমি সুন্দরবন যাই এবং সেখানে দিন সাতেকের মতো অবস্থান করি। এই গবেষণা টিমের প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে জীববিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত সুন্দরবন বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ধারণকারী একটি নির্দেশকের আচরণগত দিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। এই জৈব নির্দেশকটি মদনটাক নামের একটি পাখি। এই পাখিটিকে কেন এবং কিভাবে বাস্তুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তার কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

এলাকাভেদে মদনটাককে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন–মদনটাক, মদনচোর,

হারং ও আড়ং। পাখিটির বৈজ্ঞানিক নাম Leptoptilos javanicus এবং পাখিটি Ciconiidae পরিবারের সদস্য। ইংরেজিতে একে বলা হয় লেজার অ্যাটজুট্যান্ট। মদনটাক বকজাতীয় একটি বড় আকারের পাখি। পাখিটি লম্বায় ১১৫ সেন্টিমিটার। পরিবেশ নানাভাবে দূষণযুক্ত হওয়ার কারণে পাখিটি এখন খুবই বিপন্ন অবস্থায় আছে। বাংলাদেশে নির্দিষ্ট কয়েকটি বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থায় মদনটাককে পাওয়া যায়। তার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রে। পাখিটির অনেক লম্বা দুটি পা আছে। দিনের বেলা খাবার গ্রহণ করে, তবে খুব ভোররাতে বাসা থেকে খাবারের সন্ধানে বের হয়। খুবই চুপচাপ থাকে, কিন্তু বাসার নিকট গিয়ে এক প্রকার উচ্চস্বরে শব্দ করে। সাধারণভাবে জোড়ায় জোড়ায় থাকে, কোনো কোনো সময় দলগতভাবেও অবস্থান করে। খুবই নিরীহ প্রকৃতির প্রাণী। একে পানিতে ডুবে থাকা কর্দমাক্ত সমতলভূমিতে খাবার খুঁজে বেড়াতে দেখা যায়। কাঁকড়া ও ব্যাঙ জাতীয় প্রাণী, সাপ জাতীয় জলজ সরীসৃপ, বিভিন্ন জাতীয় মাছ, বড় বড় পোকা-মাকড় ও তাদের লার্ভা ইত্যাদি খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। তাই ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের (বাস্তুতন্ত্র) চর এলাকায় এদের বেশি দেখা যায়। আমাদের সুন্দরবন এদের আদর্শ জায়গা। তাই এখানকার চর এলাকায় এদের খাবারের আচরণবিধি খুবই স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। মার্চ থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে এরা বাসা বেঁধে থাকে। এরা বড় বৃক্ষে বাসা বাঁধে। কোনো কোনো সময় এক জোড়ায় আবার কোনো কোনো সময় কলোনিতে বাসা বেঁধে থাকে।

মদনটাকের খাদ্যাভ্যাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মদনটাক যে ট্রফিক লেভেলে অবস্থান করছে, তার পূর্বে আরো চার-পাঁচটি ট্রফিক লেভেল রয়ে গেছে। পাখিটির ইকোসিস্টেমে জৈব শক্তি এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে স্থানান্তরকালে ঐ বাস্তুতান্ত্রিক নিয়মে কোনো দূষণ পদার্থ (বিশেষ করে ভারী ধাতব দ্রব্য) প্রথম ট্রফিক লেভেল থেকে শেষ ট্রফিক লেভেলে যাওয়ার সময় প্রত্যেক ধাপে ঘনীভূত হতে থাকে। অর্থাৎ যেসব জীব অন্য জীব দ্বারা ভক্ষিত হয়, তাদের দেহে দূষণ দ্রব্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'বায়ো-অ্যাকিউমুলেশন'। আর ঐ পদ্ধতির প্রকাশ করার একককে পিপিএম (Parts per million) বলা হয়। আমাদের এই সুন্দরবন ইকোসিস্টেমে সাধারণত মদনটাক বা বকজাতীয় প্রাণী ৫ নং খাদ্যধাপে অবস্থান করে। আমরা এখন দেখব এই জাতীয় প্রাণীতে দূষণ পদার্থ (পারদ, সীসা, আর্সেনিক ও ডিডিটি) কিভাবে বেড়ে যায়। সুন্দরবন ইকোসিস্টেমে ১ নং ধাপে থাকে জুয়োপ্ল্যাংকটন বা ফাইটোপ্ল্যাংকটন (ডেফোনিয়া নামক আণুবীক্ষণিক জীব)। ২ নং ধাপ হিসেবে তাদের খায় ছোট মাছ (ঢেলা-মলা জাতীয় মাছ)। ৩ নং ধাপে তাদের খায় কাকিলা (Xenentodon cancila-freshwater garfish) জাতীয় মাছখেকো মাছ। ৪ নং ধাপ হিসেবে ঐ মাছকে খায় জলজ সাপ। ঐ সাপকে খায় মদনটাক কাদামাটি থেকে উঠিয়ে, ৫ নং ধাপ হিসেবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায়, যখন দূষণ পদার্থ (ভারী ধাতব পদার্থ) নির্গত হয়ে ঐ ওয়েটল্যান্ড ইকোসিস্টেমে চলে আসে তখন এমন দাঁড়ায় যে জুয়োপ্ল্যাংকটন দূষণ পদার্থ থাকে ০.০৪ পিপিএম, ছোট মাছে ঘনীভূত হয়ে তা হয় ০.২৫ পিপিএম, কাকিলা মাছে হয়ে দাঁড়ায় ২.০৭ পিপিএম, সাপে বৃদ্ধি পায় ৩.৫৭ পিপিএম এবং সর্বশেষ মদনটাকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৩.৮০ পিপিএম। এই ঘনীভূত ১৩.৮০ পিপিএম হয় মদনটাক জাতীয় প্রাণীর ডিমে। যার ফলে বেশির ভাগ ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় না । যদিও বাচ্চা ফুটে বের হয়, তখন তারা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেয়। ফলে পাখিটি বিলুপ্ত হয়ে যায় দ্রুত। তার চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার হলো, যখন মানুষ ঐ পাখির গোশত খায় তখন মানুষের এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের উপর কী ধরনের চাপের সৃষ্টি হয় তা সহজেই অনুমেয়। এতে মানুষের পরবর্তী প্রজন্মের বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেবার আশংকা থাকে।

জাপানের ওকিনাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জজির সাথে আমার যোগাযোগ আছে। অতি সম্প্রতি তিনি একটি গবেষণায় এ ধরনের বিষয়ের উপর কাজ করেছেন এবং বলেছেন, জাপানে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিঃসরণের প্রভাব পড়েছে পরিবেশের উপর। দেশটিতে বিকারগ্রস্ত প্রজাপতির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ফুকুশিমা পারমাণবিক দুর্ঘটনার পর সংগৃহীত প্রজাপতির উপর গবেষণা করে এর প্রমাণ মিলেছে। অতিসত্বর এর প্রভাব মানুষের প্রজন্মের উপর পড়বে। আমাদের সুন্দরবনে এমন অবস্থার আশঙ্কা অনেক বেশি।

আগেই বলেছি, মদনটাকের খাদ্যাভ্যাসে দেখা যায়, মদনটাক যে ট্রফিক লেভেলে অবস্থান করছে তার পূর্বে আরো চারটি ট্রফিক লেভেল রয়ে গেছে। মদনটাকের ইকোসিস্টেমে এই ট্রফিক লেভেলগুলোর মধ্যে শক্তি সঞ্চালনের যে নিয়মতান্ত্রিকতা রয়েছে তাকেই বলা হয় এনার্জি ফ্লো ইন ইকোসিস্টেম। এই নিয়মতান্ত্রিকতায় একটি প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত জৈব-অজৈব শর্তগুলো কতটুকু ক্ষতিকর বা উপকারী ভূমিকা পালন করে তা নির্ণয় করে ইকোসিস্টেমের এনার্জি ফ্লো। আর তাই অজৈব শর্তগুলো যদি মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে তখনই প্রশ্ন থাকে, সেই ক্ষতি সাধন ঐ প্রাণীটিকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে কি না? উপরে উল্লিখিত এই নিয়মতান্ত্রিকতাকে যে যে এজেন্ট বিনষ্ট করতে পারে তাদের গতিবিধি এবং প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে অগ্রসর হওয়া মানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। আমাদের দেশ, বিশেষ করে সুন্দরবন প্রাকৃতিক দিক থেকেই অসাধারণ সম্পদের আধার বা হ্যাবিট্যাট। এই হ্যাবিট্যাট বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার পদ্ধতি উদঘাটন করাই বিজ্ঞানের কাজ। আমাদের পরিবেশবিদ্যার উদ্দেশ্য হতে হবে প্রকৃতি সম্পর্কে মূল ধারণাগুলো একত্রিত করে একটি শব্দভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা, যা মানব ও জীবকল্যাণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনায় পরিবেশবিদ্যা বলে, 'Scientific method of ecological interpretation brings together the central themes which unify the subject of ecology and establishes a sound basis for application to be made in the interest of mankind.' অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা মূল ধারণাসমূহকে একত্রিত করে, যা পরিবেশবিদ্যা বিষয়কে সমৃদ্ধ করে এবং মানবকল্যাণের স্বার্থে এই সমৃদ্ধ অবস্থাকে ব্যবহারের উপযুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যবহার উপযুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে প্রাকৃতিকভাবে যে নিয়মতান্ত্রিকতা চলমান আছে তাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। সমৃদ্ধ না করে ভেঙে ফেলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ জৈব সম্পদ হত্যার শামিল।

ড. এম এ বাশার: অধ্যাপক, বায়োডাইভারসিটি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: m.abulbashar@gmail.com